এগিয়ে যেতে হবে আলোকিত দিগন্তে

– আবুল হোসেন খোকন

বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের জীবিত সেক্টর কমান্ডাররা এখন একজোট হয়ে একটি দাবি বাস্তবায়নের চেষ্টায় আন্দোলন করছেন। দাবি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার। তাদের এই দাবি এবং একজোট হওয়া নিয়ে সমাজে কিছু প্রশ্ন যে উঠেনি– তা নয়। উঠেছে। তবে যারা প্রশ্ন তুলেছেন তাদের মধ্যে ভিন্নতা আছে। যারা যুদ্ধাপরাধী বা এই অপরাধীদের দোসর– তারা তুলেছেন শত্রুতার দৃষ্টিতে। আর যারা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চান– তারা তুলেছেন গঠনমূলক দৃষ্টিতে, আত্মসমালোচনার দৃষ্টিতে এবং অতীতের ভুল-ত্রুটি থেকে পরিশুদ্ধির দৃষ্টিতে। সুতরাং শত্রুদের প্রশ্ন নিয়ে কথা নয়। কারণ যারা শত্রু– তারা শত্রুই, তাদের সমালোচনা-প্রশ্ন নিয়ে করুণা করার কিছু নেই।

এখানে মিত্রদের প্রশ্ন নিয়ে কিছু সমস্যা রয়েছে। তা হলো, এই গঠনমূলক-আত্মসমালোচনামূলক বা ত্রুটি বিশ্লেষণমূলক প্রশ্নগুলো তুলতে গেলেই স্যাবোটাজ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, নিজেদের জন্য বিব্রতকর হয়। ফলে এগুলো টেনে আনা থেকে বিরত থাকা হয়। টেনে আনাকে অনেক সময় 'শত্রুপক্ষের স্বার্থরক্ষা' বলে মনে হয়। আর এ প্রশ্নগুলো যখন একেবারেই নিজস্ব পরিমণ্ডল বা ফোরাম থেকে জনসমুখ্যে নিয়ে এসে আত্মশুদ্ধিটাকে সর্বাত্মক করার বিষয় চলে আসে– তখন একে আরও ভয়ংকর 'বিপদজনক' বলে ভাবা হয়। সে কারণে আমাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আড়ালে থেকে গেছে এবং এই আড়ালটা এক সময় 'গোকুলে বাড়িছে সে'র মতো অবস্থা হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ আমরা কখনই আত্মসমালোচনা করতে চাই না বিব্রত হবো বলে, পরিশুদ্ধ হতে চাই না অপরাধটা জানাজানি হয়ে পড়বে বলে। তারপরেও আমরা সবাই জনগণের কথা বলি, তাদেরকে সবার উপরে মনে করি, দেশের মালিক বলে আইন করি– কিন্তু আত্মসমালোচনার বিষয়টি নিজস্ব গণ্ডিতে তুলতে রাজি হলেও এই জনগণের বেলায় রাজি হই না। হয়তোবা একারণেই এই দেশের মালিকেরা অনেক কিছু বিশ্বাস করতে চায় না, সহজভাবে নেয় না, আর নিজেদেরকে তারা দেশের মালিক বলেও মনে করে না। এখানে হয়তো একারণেই যোজন যোজন দূরত্ব তৈরি হয়েছে, বিশ্বাসের ঘাটতি গড়ে উঠেছে। আর এ সুযোগটাই নিয়েছে শত্রুপক্ষ। অর্থাৎ গোকুলে এভাবেই অশুভের বাড়-বাড়ন্তের ঘটনা ঘটেছে।

সেক্টর কমান্ডারদের নেতৃত্বে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবির আন্দোলন নিয়ে কথা হচ্ছিল। প্রবাসে অবস্থানকারী এক শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু সম্প্রতি এ প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন, যেন এ রকম লেখা না লেখা হয়– সেজন্য বন্ধুরা তাকে বলেছেন। কারণ, এতে যুদ্ধাপরাধী-স্বাধীনতাবিরোধীরা উৎসাহিত হবে। প্রশ্ন উঠবে এতোদিন পর এসব কথা কেন, উদ্দেশ্য কি? কিন্তু মানুষ তো ভুল থেকেই শিক্ষা গ্রহণ করে, পেছনে ফিরে যদি না তাকাই তাহলে ইতিহাসের প্রয়োজনটা কি?

তাঁর এই কথায় এক'শ ভাগ যুক্তি রয়েছে। আমি যদি আমার ভুলটা শুধরে না নেই, বা শুধরে নেবার চাপের মুখে না পড়ি– তাহলে শুধরাবো কি করে? আর না শুধরালে আসল গিলটি বা বধ করার শয়তানটা নিজের ভেতরেই থেকে যাবে। তখন ফের সুযোগ বুঝে ছুরি মারা হবে, মানুষকে সামনে ঠেলে দিয়ে মই টান দেওয়া হবে, অথবা মাঝ সমূদ্রে গিয়ে জাহাজ ডুবিয়ে দেওয়া হবে। আসলে এরকম আশঙ্কা থেকে মুক্ত হওয়া একটা জরুরি বিষয় তো বটেই। সেক্টর কমান্ডারস ফোরাম-এর ব্যানারে '৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধের জীবিত সেক্টর কমান্ডাররা এখন যে উদ্যোগটি নিয়ে কাজ করছেন– তা নিঃসন্দেহে আরেকটি মহান কাজ। শহীদ জননী জাহানারা ইমামের পর এটি হতে পারে আরেকটি ইতিহাস, আরেকটি গৌরবের অধ্যায়। সে কারণে এখানে সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন আছে এজন্য যে– এখানে যেন কোন

সুবিধাবাদী চক্র যোগ হওয়ার সুযোগ না পায়, যেন কোন অন্তর্ঘাতি মহল ভাল মানুষের মুখোশ পড়ে জায়গা করে না নেয় । আর সেইসঙ্গে নেতৃত্বও যেন আত্মসমালোচনা-আত্মশুদ্ধি থেকে বিচ্যুত না হন এবং একে দেশের মালিক জনগণ থেকে আড়ালে না রাখেন ।

এ প্রসঙ্গে প্রবাসের বন্ধুটি বেশ মূল্যবান কতগুলো কথা বলেছেন । তিনি উল্লেখ করেছেন, একাত্তরে পল্টন ময়দানে ৯৩ হাজার পাকসেনা আত্মসমর্পণ করেছিল, কিন্তু তাদের এদেশীয় দোসরা আত্মসমর্পণ করেনি । এই দোসররা করেছিল আত্মগোপন । এদের খুঁজে বের করা হয়নি । চেষ্টাও করা হয়নি । বরং জনতার স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের দাবিকে উপেক্ষা করে 'সাধারণ ক্ষমা'র মাধ্যমে তাদেরকে সমাজে পুনর্বাসিত করা হয়েছে । সেই একাত্তরের পর যদি একটি মঞ্চ তৈরি করা হতো আজকের মতো– তাহলে তখন ঘাতকদের পুনর্বাসিত করতে শাসকদেরও বুক কাঁপতো, যুদ্ধাপরাধীরাও চিরকাল ভয়ে থাকতো । জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমাদের যে শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন, তা রক্ষা করার দায়িত্বও ছিল সকলের চেয়ে তাদেরই বেশী । অথচ তারা নিজেরা যেমন বারবার বিভ্রান্ত হয়েছেন, তেমনি জাতিকেও বিভ্রান্ত করেছেন । কখনও কখনও প্রতারণা করেছেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সঙ্গে, দেশের মানুষের স্বপ্নের সঙ্গে । একাত্তরের ঘাতকদের বসিয়েছেন মন্ত্রীপরিষদের টেবিলে । যোগ দিয়েছেন জনসভায় । দেশকে মৌলবাদী রাষ্ট্রে পরিণত করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে মেতেছেন । '৭৫-এ সেনাবাহিনীর কতিপয় জুনিয়র অফিসার যখন স্বাধীনতার মহানায়ককে সপবিারে হত্যা করলো তখন সেনাবাহিনীর প্রধান পাকিস্তান ফেরত কোন পাক দরদি অফিসার ছিলেন না, ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের একজন সেক্টর কমান্ডার । ডেপুটি চিফও ছিলেন সেক্টর কমান্ডার । তারা কেও জাতির স্থপতিকে রক্ষা তো করতে পারেন-ই নাই, এর প্রতিবাদে জ্বলে না উঠে ঘাতকদের পক্ষে সাফাই গাইতে গাইতে গেছেন রেডিওতে । প্রতিবাদ করতে গিয়ে চৌকস-মেধাবী সেনা অফিসার সেক্টর কমান্ডার খালেদ মোশাররফকে কি নিদারুণভাবে মৃত্যুবরণ করতে হলো, অথচ বাকি কোন সেক্টর কমান্ডার এগিয়ে এলেন না । এমনকি বঙ্গভবনে দেখা গেল জাতির পিতার হত্যাকারীদের ষড়যন্ত্রের টেবিলে গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতিকে । পঙ্গু সেক্টর কমান্ডার কর্নেল তাহেরকে যখন আইনের সকল নিয়ম-নীতিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে কারাগারের ভেতরে গোপন প্রহসনের বিচারে ফাঁসি দেওয়া হলো তখন কোন সেক্টর কমান্ডারকে প্রতিবাদ করতে দেখা গেল না । গভীর ষড়যন্ত্রে যখন সেক্টর কমান্ডার মঞ্জুরকে হত্যা করা হলো তখন অন্য সেক্টর কমান্ডাররা চুপ থাকতে পছন্দ করলেন । সেক্টর কমান্ডার জিয়ার মত্যুতেও কোন শব্দ উচ্চারণ করেননি তারা । দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত শহীদ জননী জাহানারা ইমাম যখন যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে দেশে-বিদেশে গড়ে তুললেন ঐতিহাসিক আলোকিত আন্দোলন, তখন ক'জন সেক্টর কমান্ডার পাশে ছিলেন? বরং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দীপ্যমান ২৪ জন আলোকিত মানুষের বিরুদ্ধে যে সরকার রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা করেছিল, সেই সরকারের জাঁদরেল মন্ত্রী ছিলেন একজন সেক্টর কমান্ডার ।

শ্রদ্ধেয় বন্ধুর প্রশ্ন ছিল, এতো দেরীতে আজ তাঁরা কেন একত্রিত হলেন । ৩৭ বছর লাগলো তাঁদের একমঞ্চে দাঁড়াতে । এই দীর্ঘ সময়ের ভেতর একাত্তরের পরাজিত শিকারীরা বাংলার মাটিতে শক্ত শেকড় পুঁতে ফেলেছে । রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অংশীদার হিসেবে নিজেদের গাড়িতে উড়িয়ে দিয়েছে আমাদের প্রিয় পতাকা । বাংলাদেশের পুঁজি বিনোয়োগের প্রায় সকল অঙ্গনে তারা কালো ছায়া ফেলেছে । অস্বীকার করছে স্বাধীনতাকে, জাতীয় সঙ্গীতকে । সমাজের সকল পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে তাদের দূষিত চেতনাবোধ, প্রতিক্রিয়াশীলতা । লাথি মারতে শুরু করেছে মুক্তিযোদ্ধার পিঠে ।

এ রকম দেওয়ালে পিঠঠেকা-মগজে পেরেক ঢোকা একটা অবস্থায় সেক্টর কমান্ডারা যে শুভশক্তিতে এসে দাঁড়িয়েছেন– সেজন্য শ্রদ্ধেয় বন্ধুটি সাধুবাদ জানিয়েছেন । সেইসঙ্গে প্রত্যাশা করেছেন, এখানে ভুল-ত্রুটির আত্মশুদ্ধি হতে হবে এবং এরকম কিছু হলেই সফল পরিণতি আসবে । আর বাঙালিরা চিরকাল

বুকের খাঁচায় যে স্বপ্ন ও প্রত্যাশা পুষে আসছেন– তা পূরণ হবে। ৩৭ বছরের ক্ষয়ক্ষতির পরও তাঁরা বুকের খাঁচার দরজা খুলে দেবে, গভীর মমতায় স্বপ্ন ও প্রত্যাশার প্রশ্নে বাড়িয়ে দেবে হাত।

শেষ কথায় বলতে চাই, কূটিল বিশ্বায়নের যুগে বদলে গেছে অনেক কিছু। বদলে গেছে কর্মতৎপরতার ধরন। বদলে গেছে চিন্তা-চেতনাও। আর এই অবস্থায় জন্ম নিয়েছে অযুত-নিযুত প্রবঞ্চক। এরা নানান ছল-চাতুরিতে পারদর্শী নিজের স্বার্থে এবং শত্রুর স্বার্থে। এ জন্য তাদের পেছনে কাড়ি কাড়ি ডলার-পাউন্ড-ইউরো-পেট্রো ঢালা হয়। ঢালা হয় সাম্রাজ্য বিস্তারের স্বার্থে, মানুষের মুক্তির পথ রুদ্ধ করতে, চেতনাকে বিপথে ঠেলে দিতে, একতাকে বিনষ্ট করতে, যুদ্ধাপরাধীদের রক্ষা করতে, ধর্মভিত্তিক সন্ত্রাসবাদকে বিস্তৃত করতে এবং '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্যকে ধ্বংস করতে। এ কাজে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া আদর্শচ্যুত লোকদেরও যুক্ত করা হয়। এরকম এক সংমিশ্রণ ঘটিয়ে গড়ে তোলার চেষ্টা হয় '৭১-এ যারা যুদ্ধাপরাধীদের প্রভু ছিল– তাদের অভয়ারণ্য।

সুতরাং আজকের লড়াই কোন দলীয় স্বার্থের জন্য নয়। নয় কোন সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর স্বার্থে। আজকের লড়াই সত্যিকার মানুষের স্বার্থে, দেশের মালিক জনগণের স্বার্থে। সে কারণে কোনভাবেই যেন জনগণের শত্রুরা লাভবান না হয়– সে দায়িত্বও নিতে হবে দায়িত্বশীলদের। আর এ ক্ষেত্রে বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি করতে পারলেই কেবল– মানুষ তার নেতৃত্বকে বুকে টেনে নেবে এবং তখনই ঘটে যাবে '৭১-এর মতো আরেকটি মহান বিজয়, আসবে মমতাভরা প্রত্যাশার প্রাপ্তি। আমাদের এগিয়ে যেতে হবে আলোকিত সেই দিগন্তের পথে।

- **আবুল হোসেন খোকন :** সাংবাদিক-কলামিস্ট ও মানবাধিকার কর্মী।